হয়বদন--গিরিশ কারনাড

সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর-সংকেত

ভারতীয় নাট্য ও অভিনয়-সংস্কৃতির নিবিড় ছায়াপাত আছে হয়বদন-এর অঙ্গনে।--আলোচনা করো।

ক) নাটক বলতে আজ আমরা যে বিশেষ সাহিত্য-প্রকরণকে জানি, বুঝি তা একঅর্থে ইউরোপীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবজাত। উনিশ শতকীয় নবচেতনার প্রভাবে আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে যে নতুন নতুন সাহিত্য-সংরূপের প্রচলন হয়েছিল নাটক তার একটি।

খ) নাটক সম্পর্কিত উপরিউক্ত বক্তব্য এমনিতে অযথার্থ নয়। তবে তারপরেও কিছু কথা থেকে যায়। প্রাক্ উনিশ শতকে ভারতীয় জনসংস্কৃতিতে নাটক বা অভিনয় সংস্কৃতির প্রচলন ছিল না এমনটা কিন্তু নয়। বহুকালাবধি আমাদের দেশে নাট্য-সংস্কৃতির ধারা বহমান ছিল এবং নিজস্ব ক্ষেত্রে তার অসাধারণত্ব নিয়েও সংশয়ের কোনো অবকাশ ছিল না। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ বিষয়। প্রাকৃত ভাষাতেও কমবেশি নাট্যচর্চার সন্ধান রয়েছে। ভারতীয় নাট্যসংস্কৃতির উজ্জ্বলতম অধ্যায় ভরতের নাট্যশাস্ত্র। নাট্যতত্ত্বের আলোচনায় নাট্যশাস্ত্রে-র গুরুত্ব আজও অমলিন।

গ) ভারতীয় নাট্য-সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি অধ্যায়, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এক্ষেত্রে একটা অপ্রিয় কথাও আছে। আমরা ভারতীয়, বিশেষত বাঙালিরা, আমাদের এই যে বিরাট ঐশ্বর্যশালী নাট্য-সংস্কৃতি তার ঐতিহ্যকে সেভাবে ধারণ ও লালন করেনি। আমরা এর কথা একপ্রকার বিস্মৃত হয়েছিলাম। আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর চর্চা ছিল না বললেই চলে। এই অবস্থায় উনিশ শতকে আমরা যখন ইউরোপীয় নাট্যসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হলাম তখন অত্যন্ত চমকিত হই। বিষটিকে সম্পূর্ণ নতুন বলে মনে হয় এবং আমরা প্রাণপণে এই নতুনের অনুকরণ করতে উঠেপড়ে লাগে। এতে আমাদের নাট্য-সংস্কৃতি সেভাবে ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

ঘ) একথা বলা হলে ভুল হবে যে, বাংলা নাটকের সূচনা পর্বে আমাদের নাট্যকাররা সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের কথা স্মরণে রাখেন নি। কারও কারও মধ্যে বরং একটু বেশি রকমভাবে সংস্কৃত নাটককে অনুসরণ করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছিল। তবে শেষাবধি তারা সেভাবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারেননি। তাঁরা ক্রমশ পিছু হটতে শুরু করেছিলেন এবং একটা সময়ে নাট্যক্ষেত্র থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অতঃপর আমাদের নাট্যাঙ্গনে ইউরোপীয় নাট্য-সংস্কৃতির একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ঙ) আমাদের নাট্য-সংস্কৃতিতে ইউরোপীয় নাট্যরীতির এই যে অপ্রতিহত প্রাধান্য তার ফলাফল কিন্তু ভালো হয়নি। সাহিত্য বস্তুনিষ্ঠ বিষয়; নাটকের বস্তুনিষ্ঠতা আরও বেশি। বাস্তবের মাটি থেকে রস সংগ্রহ করতে না পারলে নাট্য-বৃক্ষ কখনো সজীব ও সবল হয় না। গ্রিক দেশীয় বা শেকসপীরীয় নাটক ইউরোপীয় নাট্যবাস্তবতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বঙ্গদেশীয় বা ভারতীয় সমাজবাস্তবতার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফলত আমাদের নাট্যচর্চায় সমস্যা হয়েছে।

চ) কোনো কোনো নাটককার আমাদের নাট্যসাহিত্যের এই দুর্বলতার দিকটির কথা উপলব্ধি করেছিলেন একটা সময়ে। অতঃপর তাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন এর প্রতিবিধানকল্পে। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, আমাদের নাটককে যদি বলিষ্ঠ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তবে ভারতীয় নাট্যরীতিকে কমবেশি মান্যতা দিতেই হবে। সেই অনুসারে তাঁরা উদ্যোগী হন এবং তাঁদের হাত দিয়ে নতুন ধারার নাটক লেখা হয়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই নতুন ধারার নাটক রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন নাট্যকার সেলিম আলদিন।

ছ) সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য ছিল, পাশাপাশি ভারতীয় জনজীবনে প্রচলিত ছিল লোকায়ত ধারার বিশেষ অভিনয়-সংস্কৃতি। সেলিম আলদিন তাঁর নাটকে আধুনিক নাট্যরীতির সঙ্গে এই লোকায়ত অভিনয়-সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন এবং অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এক্ষেত্রে বাংলায় যেমন সেলিম আলদিন, অপরাপর আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ধারায় তেমনি গিরিশ কারনাড।

জ) সংস্কৃত নাটকের অন্যতম প্রধান দুর্বলতার দিক নাট্যদ্বন্দের অগভীরতা। সংস্কৃত সাহিত্যে নাটক ও কাব্যের মধ্যে প্রকরণগত

বিভিন্নতাই প্রধান। ভাবগত বিশেষ বৈসাদৃশ্য নেই। তাই সংস্কৃত সাহিত্যে নাটককে বলা হয় দৃশ্যকাব্য। সেলিম আলদিন বা গিরিশ কারনাডরা উপলব্ধি করেছিলেন নাট্যদ্বন্দ্বের মূল গভীরে প্রোথিত না হলে ইউরোপীয় নাট্যসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত একালের দর্শক-পাঠকের কাছে তাঁদের নাট্যকৃতি সেভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। এদিকে সে নাট্যদ্বন্দ্বকে ভারতীয় জীবন-সংস্কৃতি ও অভিনয়-সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে রচনা করা জরুরি। এই দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে তাঁরা যথাসম্ভব করেছিলেন এবং তাঁদের সেই প্রচেষ্টার পথ ধরে জন্ম হয়েছিল হয়বদন এর মতো নাটকের।

ঝ) হয়বদন-এ ভারতীয় নাট্য-সংস্কৃতির যে অনুবর্তন রয়েছে তার স্বরূপ নিম্নরূপ

১। নাটকের প্লট সরল একমুখী নয়। একটি নাট্য-ঘটনার মধ্যে অন্য একটি নাট্যদৃশ্য চলে এসেছে। যেন মনে হয় একটি নাটকের ভিতরের বিষয়, অন্যটি বাইরের। বস্তুত তা কিন্তু নয়। উপস্থাপিত সম্ভাব্য সব ঘটনার সমন্বয়ে সম্প্রসারিত হয়েছে নাট্যবাস্তবতার ভিত্তি। নাটকের সূচনায় ঘোড়ামুখো মানুষটির আগমন ও তৎ সম্পর্কিত বৃত্তান্ত নিতান্ত বাইরের বিষয় বলে মনে হলেও বস্তুত যে তা নয়, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

২। নাটকের মধ্যে লৌকিক, অলৌকিক, অতিলৌকিক সব ঘটনার সমাবেশ রয়েছে। এমন সব অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ভারতী নাট্যসংস্কৃতি, অন্য অর্থে জীবনসংস্কৃতি সম্মত। (অনুষঙ্গ চয়ন করে ব্যাখ্যা করতে হবে)

৩। দর্শককে নাটকের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তোলা হয়েছে। অধিকারী মশাই বিভিন্ন সময় দর্শকদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করতে চেয়েছেন। (অনুষঙ্গ চয়ন ও ব্যাখ্যা)। এমনভাবে দর্শককে নাট্যবিষয়ের সঙ্গে একাত্ম করে নেওয়া ভারতীয় অভিনয় সংস্কৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইউরোপীয় অভিনয়-সংস্কৃতির সঙ্গে এর বিস্তর পার্থক্য বর্তমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় অভিনয় সংস্কৃতির দুটি প্রধান ধারা রয়েছে; প্রথাবদ্ধ ধারার নাটক ও যাত্রাপালা। দর্শককে নাট্য-বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম করে নেওয়া যাত্রাপালার জনপ্রিয়তম অধ্যায়।

৪। প্রবল উৎকণ্ঠা, সে উৎকণ্ঠাকে কমবেশি জারী রেখে উপসংহারে পৌঁছে যাওয়া ইউরোপীয় নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় নাট্যকৃতি সেদিক থেকে অনেকটাই ব্যতিক্রম। এখানে নাটকীয় উৎকণ্ঠা শেষ কথা নয়; দর্শক-পাঠককে জীবন সম্পর্কিত বিশেষ প্রত্যয়ে পৌঁছে দেওয়ার দিকে জোর দেওয়া হয় এখানে। হয়বদন এই রীতির উজ্জ্বল উদাহরণ।

৫। ইউরোপীয় নাটককে সাধারণভাবে পাঁচটি নাট্যসন্ধিতে বিভক্ত করা হয়। এই নাট্যসন্ধির কেন্দ্রে থাকে ক্ল্যাইম্যাক্স। নাটকের সূচনায় নাট্যদ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়, অতঃপর তা বাড়তে-বাড়তে ক্ল্যাইম্যাক্সে পৌঁছায়, তারপর ক্রমশ পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। ইউরোপীয় নাটকের এই যে সাধারণ রীতি ভারতীয় নাট্যকৃতিতে তা সেই অর্থে মান্যতা পায় না। বলার কথাই এখানে শেষকথা। বক্তব্য বিষয়কে উত্তম রূপে উপস্থাপন করা হয় এখানে। তার জন্য প্রয়োজনে নাট্যশৈলীকে পাশে সরিয়ে রাখা হয়। হয়বদন-এ এর সার্থক অনুবর্তন আছে। এখানে সেই অর্থে কোনো ক্ল্যাইম্যাক্স নেই। চূড়ান্ত কোনো নাট্যদ্বন্দ্বের উপর নাটকটিকে প্রতিষ্ঠিত করার সচেতন প্রয়াস লক্ষ্যণীয় নয়।

৬। শৈল্পিক সৌন্দর্য ইউরোপীয় নাট্যকৃতির কৃতির প্রথম ও প্রধান কথা, এখানে মানবিক মূল্যবোধের বিশেষ জায়গা নেই। ভারতীয় নাট্যকৃতি ঠিক তা নয়। এখানে মূল্যবোধের ক্ষেত্রটা অনেকটা সম্প্রসারিত। হয়বদন-ও তার ব্যতিক্রম নয়।

ঞ) হয়বদন-এ ভারতীয় অভিনয় সংস্কৃতির নিবিড় অনুবর্তন আছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় নাটকটি সনাতন ধারার নাটক সুলভ। মোটেই তা নয়। এ নাটক একান্তভাবে আধুনিক রীতির। এখানে আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যের সার্থক সমন্বয় ঘটানো হয়েছে।

২। অনূদিত হয়বদন-এর ভূমিকায় অনুবাদক শঙ্খ ঘোষ মন্তব্য করেছেন--অপরাপর ভারতীয় ভাষার নাট্যকৃতি থেকে বর্তমানে বাংলা নাট্য-সংস্কৃতির পক্ষে অনেক কিছু গ্রহণ করার আছে।--তাঁর এই অভিমতের যৌক্তিকতা বিচার করো।

ক) এই সেদিন পর্যন্ত এমন একটা ভাবনা অনেকের মধ্যেই খুব দৃঢ় ছিল। মনে করা হতো, বাঙালি আজ যা ভাবে অবশিষ্ট ভারত কাল বা পরশু তা ভাবতে পারে। এখন কিন্তু অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে। এখন অবশিষ্ট ভারত বাঙালিকে আর সেই শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। বাঙালিরাও নিজের উপর আর অতখানি বিশ্বাস রাখতে পারছে না।

খ) বাঙালির এই যে পশ্চাদপসরণ তার ছায়াপাত আরও অনেক ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রকট। প্রাগাধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য সমকালীন অপরাপর ভারতীয় সাহিত্যের তুলনায় যথেষ্ট অগ্রসর অবস্থানে ছিল। আবার উনিশ শতকে ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবে যখন ভারতীয় সাহিত্যে আধুনিকতার প্রবর্তন হয়েছিল তখনও অগ্রসর অবস্থানে বিরাজ করছিল বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, মীর মশাররফ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুল প্রমুখের সমতুল সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব অন্যসব ভারতীয় সাহিত্যে মোটেই সুলভ ছিল না। তখন ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের আধিপত্য ছিল একচেটিয়া। পরে আস্তে -আস্তে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে; সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটু একটু করে বাঙালিরা পিছিয়ে পড়েছে এবং সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে অন্যান্য ভাষাভাষীরা।

গ) গত পঞ্চাশ বছরে সাহিত্য অকাদেমি বা ওই জাতীয় সর্বভারতীয় সব পুরস্কারের খতিয়ান নিলে দেখা যাবে বাঙালি অগ্রসর অবস্থানে তো নেই-ই, উল্টে কোনো কোনো ভাষাভাষীদের থেকে বেশ পিছিয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে বাঙালিদের বিশেষ দুর্বলতা ফুটে উঠেছে নাট্যক্ষেত্রে। উনিশ শতকে বাংলা নাট্যসাহিত্য, সেদিনের সাপেক্ষে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ এর সমতুল ব্যক্তিত্ব সেদিন প্রায় ছিলেন না। এখন কিন্তু পরিস্থিতি বদলে গেছে। এখন ভারতীয় নাট্যক্ষেত্রে বাঙালি নাট্যকাররা মোটেই শেষকথা বলার মতো জায়গায় নেই।

ঘ) এটা মনে করলে ভুল হবে যে, এখন বাঙালিরা তাদের নাট্যকৃতির ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত হয়ে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেছে। নিজস্বক্ষেত্রে বাদল সরকার, উৎপল দত্ত, মনোজ মিত্র প্রমুখের অনন্যতা অনস্বীকার্য। এঁদের এই অনন্যতা সত্য, আবার নাট্যক্ষেত্রে বাঙালিদের পিছিয়ে পড়াটাও সত্য। আসলে এই দুই মাঝে রয়েছে আরও একটি সত্য। যে সত্যের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত বৈপরীত্য তৈরি হয়েছে।

ঙ) উনিশ শতকে যখন গিরিশচন্দ্র তাঁর সহযোগীদের হাত ধরে বাংলা নাটকের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাচ্ছিলেন তখন তাঁরা সর্বোপরি দেশীয় অভিনয়-সংস্কৃতি থেকে সরে এসে ইউরোপীয় নাট্য-সংস্কৃতিকে বরণ করে নিয়েছিলেন। সেদিনের পক্ষে এটা নিশ্চয়ই বিশেষ দোষের ছিল না। তবে পাশাপাশি সময়ের সাপেক্ষে এই অবস্থান থেকে সরে আসাটাও জরুরি ছিল। যেটা করে ওঠা হয়নি। ফলত ভুগতে হয়েছে। দেশীয় সংস্কৃতির মূল থেকে বিচ্যুত হয়ে সর্বাত্মক সাফল্যকে করায়ত্ত করা যায় না। উৎপল দত্ত বা বাদল সরকারদের ক্ষেত্রে যা হয়েছে। তাঁদের নাট্যকৃতি বাঙালিদের জীবন-সংস্কৃতির সঙ্গে সেভাবে সম্পৃক্ত নয়। উৎপল দত্তের আশ্রিত যে মাক্সবাদ তা অদ্যাবধি বাঙালির জীবনে নিতান্ত বাইরের বিষয় হয়েই থেকে গেছে। অন্যদিকে বাদল সরকার যে বিপন্ন বাস্তবতার উপর তাঁর নাটককে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন বাঙালির জাতীয় জীবনে সে বাস্তবতার অনুবর্তনও সর্বাত্মক নয়। ফলত সমস্যা হয়েছে।

চ) গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন, বাঙালি-র মর্মে মর্মে ধর্ম, কাজেই মর্মাশ্রিত হয়ে নাটক রচনা করতে হলে ধর্মাশ্রিত হতে হবে। কথাটিকে আক্ষরিক অর্থে না-নিয়ে যদি একটু বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করা হয় তবে বর্তমানে বাংলা নাটকের সীমাবদ্ধতার দিকটি সুস্পষ্ট হতে পারে। নাটক এমন এক সাহিত্য-মাধ্যম যা দিয়ে জনমানসকে খুব বেশি করে প্রভাবিত করা যায়। হাজার হাজার মানুষ আলোড়িত হতে পারে নাট্যরচনা ও তার অভিনয়ের সূত্রে। আর এখানেই রয়েছে বাংলা নাটকের বিরাট দুর্বলতা। উৎপল দত্ত বা বাদল সরকারদের নাট্যকৃতি নিছক শৈল্পিক ও বৌদ্ধিক ক্রীড়া কৌশলের সীমায় আবদ্ধ থেকে গেছে, জীবনের সঙ্গে এর যোগ মোটেই দৃঢ় নয়। এসব নাটকের সূত্রে দর্শক-পাঠক বড়োজোর তাদের বৌদ্ধিক মনকে নতুন করে ঘষে-মেজে নিতে পারে; এর দ্বারা সেভাবে আন্দোলিত হতে পারে না। যতদিন গেছে বাংলা নাটক জীবনের উর্বর ক্ষেত্রে থেকে সরে শৈল্পিক ক্রীড়া কৌশলে পরিণত হয়েছে। এটা চলতে থাকলে বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ মোটেই আলোকিত নয়। খুব সম্ভব আমাদের নাটকের এই দুর্বলতার দিকটি অনুভব করেই মাননীয় সমালোচক কর্তৃক প্রশ্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি করা হয়েছে।

ছ) ঐতিহ্যের শিকড় থেকে সরে এসে বাংলা নাটকের এই যে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়া তার সাপেক্ষে গিরিশ কারনাডের হয়বদন অত্যন্ত সম্ভাবনাময় সৃষ্টি। নাটকটি আপাদমস্তক ঐতিহ্যের আবরণে আবৃত। (বিস্তৃত পরিসরে ব্যাখ্যা করতে হবে)

জ) দেশীয় নাট্যসংস্কৃতির ঐতিহ্য ও ইউরোপীয় নাট্যবাস্তবতা, দুই এর সুষ্ঠু সমন্বয় আছে হয়বদন এ; এই সমন্বয়ই বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের আলোর পথ। শঙ্খ ঘোষ মহাশয় এই পথেরই অনুসারী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

ঝ) পরিশেষে আরও একটি কথা। ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সমন্বয় ঘটিয়ে হয়বদন-এ নাট্যকার গিরিশ কারনাড দেশীয়

নাট্যসাহিত্যের যে সম্ভানার দিকটি পরিস্ফুট করেছেন সেই ধারাতেই তাঁর নাট্যক্ষেত্রকে প্রস্তুত করেছেন ওপার বাংলার প্রখ্যাত নাট্যকার সেলিম আলদিন। মাননীয় সমালোচক মহাশয় খুবসম্ভব সেলিম আলদিনের নাট্যকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নন।

৩। হয়বদন-এর নাট্যগুণ অসামান্য। তবু নাটকটি নিয়ে তেমন উচ্ছ্বসিত হতে চাননি কোনো কোনো নাট্যবোদ্ধা। তাঁদের এই অবস্থানের যৌক্তিকতা বিচার করো।

ক) নাটক বলতে এমনিতে দৃশ্যে-বিন্যস্ত দ্বন্দ্বময় যে সাহিত্য-সংরূপকে বোঝান হয় তার সাপেক্ষে হয়বদন-কে বিচার করলে নাটক হিসাবে এর অনন্যতা অনস্বীকার্য।

খ) নাটকটি যেমন অসামান্য নাট্যগুণে ঋদ্ধ তেমনি এতে রয়েছে দেশীয় নাট্য-সংস্কৃতি ও ইউরোপীয় নাট্য-বাস্তবতার সুষ্ঠু সমন্বয়; যা আমাদের নাট্যাঙ্গনে সুলভ বিষয় নয়।

গ) এমন অসামান্যতার পাশাপাশি নাট্যকৃতি হিসাবে হয়বদন নিয়ে সত্যিই কি কোনো নেতিবাচক ভাবনা প্রশ্রয় পেতে পারে!

ঘ) আমাদের মনে হয়, যাঁরা এক্ষেত্রে কমবেশি নেতিবাচক ভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন তাঁরা বিশেষ ভুল করনেনি। আসলে নাটকটির অসাধারণত্বের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে এক বিশেষ দুর্বলতার দিক।

ঙ) নাটকের প্রাণ কী? অ্যারিস্টটল বলেছিলেন প্লট; আমরা বলি চরিত্র। বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, নাটকে প্লটের গুরুত্ব অপরিসীম। প্লটের সংহতি, একমুখীনতা, গতিময়তা এসব এসব নাটকের চাবিকাঠি।

চ) নাটকে প্লটের এই যে গুরুত্ব তার সাপেক্ষে হয়বদন-এ কমবেশি দুর্বলতা লক্ষ করা যায়। নাটকটির প্লট দ্বন্দ্বময়, কিন্তু সংহত ও একমুখীনয়।--নাট্যাঙ্গনে একাধিক কিংবদন্তি জায়গা করে নিয়েছে; এতে কাহিনি-সূত্রে জটিলতা তৈরি হয়েছে--দর্শক-পাঠককে স্থানে-স্থানে যেন একটু থমকে দাঁড়াতে হয়; রসাস্বাদে ব্যাঘাত ঘটে--প্লটে প্রভূত নাট্যদ্বন্দ্ব আছে, কিন্তু তার শিল্পসম্মত নির্মাণ নেই; এক্সোপজিশন - রাইজিং অ্যাকশন- ক্ল্যাইম্যাক্স-ফলিং অ্যাকশন-ক্যাটাস্ট্রোফি; প্লটের এই বিন্যাস রীতি লঙ্ঘিত হয়েছে এখানে---এমনটা নয় যে নাট্যকারকে নির্দিষ্ট বিন্যাসরীতি অনুসরণ করতেই হবে; তিনি নিজের মতো করে সব কিছুকে সাজিয়ে নিতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে তার শৈল্পিক অসামান্যত্ব থাকতে হবে--হয়বদন-এর প্লটে এই অসামান্যত্ব নেই--নাটকটির পরিণতিতে আমরা সেই অর্থে কোনো স্থির প্রত্যয়ে স্থিত হতে পারি না; অন্যরকমের একটা অনুভূতিতে তাড়িত হতে হয়, যা ঠিক নাট্যরীতি সুলভ নয়--অতিলৌকিক বা অলৌকিক ঘটনার ঘনঘটা রয়েছে নাটকটির প্লটে, যা আদর্শ নাট্যরীতি সম্মত নয়--দেশাচার, লোকাচার, কিংবদন্তি, নাট্যবাস্তবতা সবকিছুর মিশেলে হয়বদন সাহিত্যকৃতি হিসাবে শেষাবধি যে জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে তার অসামান্যতা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই--তবে বিশেষ ভাবনা থেকে, বিশেষত বিশুদ্ধ নাট্যরীতির সাপেক্ষে বিচার করলে এর যে কিছু দুর্লতা আছে, তা অনস্বীকার্য।

৪। গুরু ও লঘুভাব হাত ধরাধরি করে রয়েছে হয়বদন-এ। এই গুরু ও লঘুভাবের সমন্বয় নাটকটি কতটা শৈল্পিক নির্মিতি পেয়েছে।

ক) লঘু-গুরু ভাবের সমন্বয়ে জীবনের পূর্ণতা--সাহিত্য জীবনের প্রতিবিম্বন--তবে নাটকের বিষয়টা আরও একটু অন্যরকমের--নাটকে আলাদা করে লঘু ও গুরু ভাবের সমাবেশ করা হয়--কমেডি ও ট্র্যাজেডি--দুই এর মধ্যে ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সন্দেহ না-থাকলেও কমেডিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

খ) কমেডি, ট্র্যাজেডি, ট্র্যাজি-কমেডি এসব আছে--তবে সেসবই শেষকথা নয়--এমন সব নাট্যকৃতি বর্তমান, যাকে ঠিক ট্রাজি-কমেডি বলা যায় না, অথচ তাতে প্রচুর পরিমাণে গুরু ও লঘুভাবের সমাবেশ রয়েছে। হয়বদন যেমন।

গ) হয়বদন-এর গুরুভাব নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার নেই। এর লঘু ভাবের ধারণ-ক্ষেত্রগুলিকে বরং আলাদা করে চিহ্নিত করা চলে--সূচনা অংশে ঘোড়া মানুষের ইতিবৃত্ত, দেবদত্ত-পদ্মিনীর প্রেম-প্রসঙ্গ, দর্শকদের নিয়ে অধিকারী মহাশয়ের শ্লেষাত্মক মন্তব্য ইত্যাদি।

ঘ) এখন প্রশ্ন, এই গুরু ও লঘুভাবের সমন্বয় কতটা শিল্পসার্থক হয়েছে। --হয়বদন বিয়োগান্ত পরিণতির নাটক--লঘুরস ট্র্যাজিক রিলিফ হিসাবে কাজ করেছে--শুধু ট্র্যাজিক রিলিফ নয়, নাটকে লঘু রসের এক স্বতন্ত্র নির্মাণ আছে, যা ট্র্যাজিক রিলিফের অতিরিক্ত কোনো তাৎপর্য বহন করে--লঘু ভাব আলাদা করে যেন নাট্য-নির্মিতি পেয়েছে--অর্থাৎ স্বতন্ত্র নাট্য-আবেদন তৈরি হয়েছে এইসূত্রে। সবচেয়ে বড় কথা, এই লঘু ভাবকে বাদ দিলে নাটকটি ঠিক পূর্ণতা পায় না। লঘু ও গুরু ভাবের সবন্বয়ে হয়বদন-এর পূর্ণতা। লঘু ভাব এ নাটকে কখনোই নিতান্ত বাইরের বিষয় হয়ে থাকেনি। অন্য অনেক নাটকের থেকে হয়বদন এখানেই কমবেশি আলাদা।

অন্যান্য গুরুগম্ভীর নাটকে লঘু ভাব নিছক আলংকারিক বিষয় হিসাবে থেকে গেছে; এই আলংকারিকতা ব্যতিরেক নাটকটির রসনিষ্পত্তিতে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। এদিকে লঘু রসের সঙ্গে হাত ধরাধরি না-করে থাকলে হয়বদন এর অঙ্গহানি হয়।
ঙ) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লঘু ভাবের স্বতন্ত্র নাট্য-আবেদন থাকলেও তা কখনোই গুরু ভাবকে ছাপিয়ে যায়নি--গুরুভাবের নাট্যনির্মাণের পাশে নিজস্বতা বজায় রেখেছে মাত্র--এতে শৈল্পিক চমৎকারিত্ব তৈরি হয়েছে।

৫। মেয়েদের অতৃপ্ত কামনা, কামনার অসুস্থতা এসবের প্রভাবে মানুষের জীবনে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে এবং হয়বদন-এও সেই সাধারণ সত্যের অনুবর্তন আছে।--আলোচনা করো।
ক) ইলিয়ড়-ওডিসি, রামায়ণ-মহাভারত থেকে শুরু করে বিশ্বের যা কিছু শ্রেষ্ঠ করুণ রসাত্মক সাহিত্যকৃতি, সেখানে প্রায় সর্বত্র ঘটনার করুণ পরিণতির নেপথ্য কারণ হিসাবে মেয়েদের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ করে দেখান হয়েছে। হয়বদন-এও তারই অনুবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে।
খ) এখন প্রশ্ন, এই যে মেয়েদের নেতিবাচক ভূমিকায় উপস্থাপন তা কী নিছকই বাস্তবের অনুকৃতি, না কি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিশেষ মানসিকতার প্রতিবিম্বন।
গ) জিজ্ঞাসাটার উত্তর পাওয়া সহজ নয়; পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিপরীতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজও যদি সমানভাবে অবস্থান করতো এবং সেখানে মেয়েদের দ্বারা রচিত সাহিত্যের প্রাধান্য থাকতো তবে হয়তো প্রশ্নটার উত্তর পেতে তেমন বেগ পেতে হত না।
ঘ) যে উত্তর এখন পাওয়ার নয় তা নিয়ে মাথাব্যথা না-করে আমরা বরং অন্য কথায় আসতে পারি। ব্যবহারিক জীবনে মেয়েরা একটু বেশি কুটিল, জটিল এসব হয়। তাদের চাওয়া, পাওয়া অনেকক্ষেত্রে স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করে; তাদের এই অস্বাভাবিক কামনা-বাসনার সূত্র ধরে একটা সময়ে আগুন জ্বলে ওঠে এবং সে আগুনে জ্বলে -পুড়ে ছাই হয়ে যায় অনেক কিছু।
ঙ) মেয়েদের এই যে অস্বাভাবিক কামনা-বাসন, তার কারণ প্রাকৃতিক না সামাজিক, তা নির্দিষ্ট করে বলার নয়। হতে পারে যুগ যুগ ধরে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নাগপাশে আবদ্ধ থাকার প্রেক্ষিতে এমন অসুস্থতা মেয়েদের মনের গভীরে বাসা বেঁধেছে; আবার এও হতে পারে, এটা প্রাকৃতিক বিষয়। মেয়েরা তাদের স্বভাবগত কারণেই এমনটা করে থাকে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের মনে হয় বিষয়টা প্রাকৃতিক নয়। কেননা প্রাণি জগতের আর কোনো প্রাণিদের মধ্যে স্ত্রী-লিঙ্গের দিক থেকে এই বিচ্যুতি দেখা যায় না।
চ) কারণ যাই হোক, মেয়েদের মধ্যে আচরণগত যে একটা সমস্যা রয়েছে এবং তারই প্রেক্ষিতে মানুষের জীবনে নানা বিপর্যয় ঘটেছে তা বলা বাহুল্য। আমাদের আলোচ্য নাট্যকৃতিও এর উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে।
ছ) পদ্মিনী এমনিতে অত্যন্ত ভদ্রজনোচিত, মার্জিত রুচির--কিন্তু তারও মধ্যে রয়েছে বিকৃত কামনা। স্বামী দেবদত্তের নিবিড় সাহচর্যতেও তৃপ্ত হয় না তার নারীত্ব। কপিলের প্রতি আকৃষ্ট হয় সে। তার এই যে চারিত্রিক বিচ্যুতি এর জন্য পদ্মিনীকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী না করা বাঞ্চনীয়। আসলে পরুষের পৌরুষত্ব ও মেধা এই দুই এর প্রতিই প্রবল আকর্ষণ রয়েছে মেয়েদের। এর কোনোটিকেই তারা তাদের কামনার জগৎ থেকে নির্বাসন দিতে পারে না। এদিকে অধিকাংশ পুরুষের মধ্যে একধারে পৌবু ষত্ব ও মেধার সার্থক সমন্বয় ঘটে না। ফলত সমস্যা হয়। পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে মেয়েরা। গৃহদাহ উপন্যাসের অচলার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। পদ্মিনীর মধ্যেও সেই সাধারণ সত্যের অনুবর্তন লক্ষ করা গেছে। কাজেই এর জন্য তাকে আলাদা করে দায়ী না করাই বাঞ্ছনীয়। (এই ভাবে কাহিনি-বিশ্লেষণ করে বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে)
জ) অনেক বিপর্যয়ের কারণ মেয়েদের যে বিকৃত কামনা তাকে আমরা এমনিতে সামাজিক বলে মত প্রকাশ করেছি, তবে একই সঙ্গে পুরুষের পৌরুষত্ব ও মেধা দুই এর প্রতি মেয়েদের যে সমান আকর্ষণ তাকে প্রাকৃতিক বিষয় বলেই মনে হয়।